ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রত্যপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু - ৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৩৩২৮৩৩৫৩

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
১) পাগলা কুকুর থেকে সাবধান, ২) হরিদ্রা (হলুদ), ৩) কোথায় বিজ্ঞান মানসিকতা, ৪) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির।

বর্ষ-১২ সংখ্যা - ১ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী/২০১৫ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

কোস্টাল পলিউশন ও ইরোসন

দূষণ, দূষণ সর্বত্র দূষণ। বিশাল সমুদ্র, সেখানেও দূষণ। দূষণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা। কোস্টাল দূষণ সাধারণভাবে মানুষের নজরে কমই পড়ে। আধুনিক সভ্যতার ডানায় ভর করেই মানব সমাজ দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে।

সমুদ্র তীর বা তটভূমি ও মোহনা দিন দিন মানব সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে দূষণ এবং তার সংঘাত ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। তটভূমিতে ও মোহনার জলে জৈব পুষ্টি পদার্থ দূষণ, রাসায়নিক পদার্থ, থিতিয়ে যাওয়া বস্তুগুলি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী ক্রিয়া কলাপের ফলে, সমুদ্র সারা পৃথিবী ব্যাপী পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতল উঁচু হচ্ছে। এর উপরে প্রায় ৮০ শতাংশ দূষণ ঘটে প্রাথমিক ভাবে শিল্প, কৃষি ও শহরে অঞ্চল থেকে আসা বর্জ্য পদার্থ দ্বারা। এছাড়া তটভূমি থেকে তেল, গ্যাস ও সামুদ্রিক তেল পরিবহনের মাধ্যমেও ভয়াবহ দূষণ ঘটে।

স্থল ভাগের নানান অবস্থা থেকে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ চক্র মাধ্যমে সামুদ্রিক বাস্তুরীতি দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। স্থল ভাগ থেকে গড়িয়ে পড়া জল পরীক্ষা করলেই তা বোঝা যায়। এই দূষণ প্রক্রিয়ায় নানা পদার্থ ঐ অঞ্চলের সমুদ্রের

এরপর 2 পাতায়

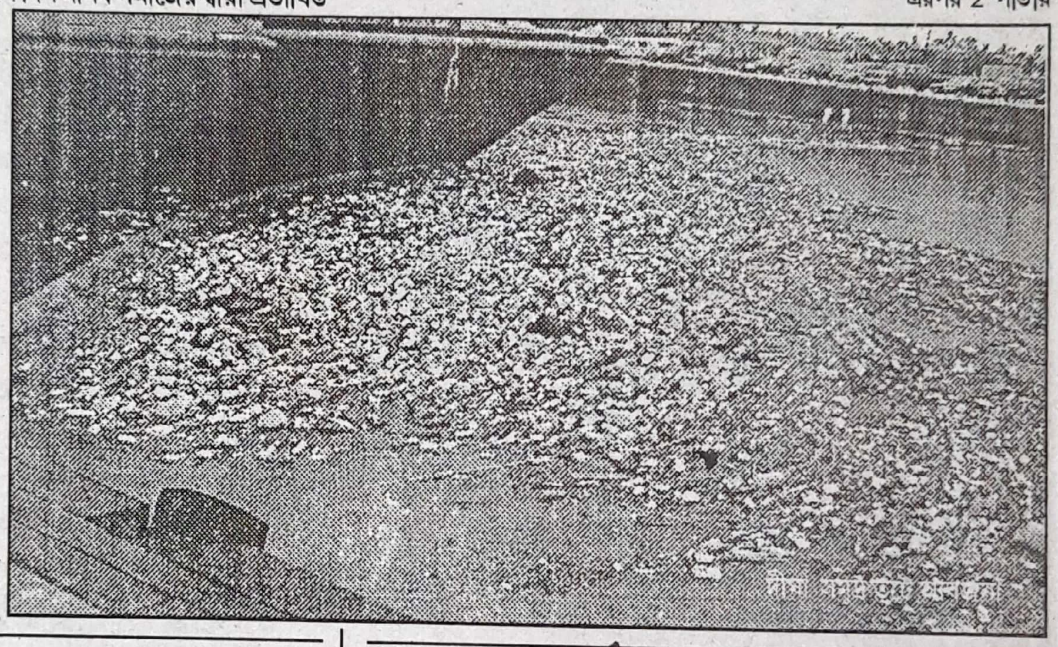

ক্যালোরি মুক্ত মিষ্টকারক কতটা নিরাপদ

বিনোদন জগতের মানুষেরা যেমন জিরো ফিগার নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ঠিক তেমনি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষেরা জিরো ক্যালোরি নিয়েও অনেকটা সচেতন। আজ মানুষের গ্যাস-অ্যাসিডিটি জ্বর মাথা ব্যথার মতো সুগারের সমস্যা এক অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সচেতন মানুষ তার খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রাহকের চাহিদা বুঝে বাজারে চলে এসেছে সুগার মুক্ত নানান জিনিস। মিষ্ট যুক্ত খাদ্য প্রস্তুতিতে চিনি ব্যবহার করা হয়। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্তদের বা যাদের দৈহিক ওজন অতিরিক্ত বেশী তাদের কথা ভেবেই চিনির বিকল্প হিসাবে খাদ্য প্রস্তুত কারক সংস্থাগুলো কৃত্রিম মিষ্ট কারক পদার্থ (বিভিন্ন রাসায়নিক পদর্থ) বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই মিষ্টি কারক পদার্থগুলোও এক ধরণের খাদ্য সংযোজক বা Food Addtives এই ধরণের পদার্থগুলি জীব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। শরীর থেকে অপরিবর্তিত ভাবে বেরিয়ে যায়। ফলে এরা দেহে শক্তি

এরপর 4 পাতায়

প্রসঙ্গ : পরিবেশ

পরিবেশ অর্থাৎ আমাদের চারপাশের যা কিছু, সমস্ত কিছু - মানুষের সঙ্গেই নানা সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জীবজ ও অজীবজ (জড়) মানুষের সুস্থ থাকা, বেঁচে থাকাটা স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবেশের ভালো বা মন্দ থাকার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষের বেঁচে থাকার সমস্ত জিনিসই মেলে পরিবেশ থেকে। তাই পরিবেশকে ঠিক রাখা খুব জরুরি। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-মৌলিক চাহিদাও। কিন্তু আজকাল এই প্রাথমিক ভাবেই থেমে থাকে না মানুষের চাহিদার ইচ্ছেগুলো। এতে যুক্ত হয়েছে অনেক কিছুই। এসেছে সামাজিক পালাবদল। বিশ্বায়ন আর নয়া উদার আর্থিক নীতি এই সামাজিক পালাবদলে প্রভাব ফেলছে। যার প্রত্যক্ষও পরোক্ষ ফলাফলে বদলে গেছে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াস - দৈনন্দিন জীবনযাপন সামাজিক পালাবদলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সামাজিক উন্নয়ন, যা কিনা আবার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একে অপরের সঙ্গে

এরপর 7 পাতায়

কোস্টাল পলিউশন ও ইরোসন

1 পাতার পর

জলে, তলদেশে তলানিতেও পাওয়া যায়।

কৃষি ঃ— কৃষি বিষয়ক নানা প্রকার পদার্থ নদী বাহিত হয়ে তটভূমিকে দূষণ ঘটায় ও জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের উপর আঘাত হানে। ঐ জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রে নির্গত বস্তু, মিথেন, অ্যামোনিয়া 'Green house' সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কৃষি ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ মারার জন্য কীটনাশক নানা প্রজাতির প্রাণীদের ক্ষতি করে। এমন কী চাষ-আবাদ না হলেও। তেল জাতীয় পদার্থ ও ব্যবহারের জন্য দূষণ ঘটে। সবুজ পদার্থ ও পশুখাদ্য (Silage) ইত্যাদি সিমেন্ট, কাদা (Slurry) সার জৈব পুষ্টি পদর্থ ও তার সঙ্গে নানাপ্রকার খনিজ পুষ্টি পদার্থ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সিলিকন ও স্বল্পমাত্রিক উপাদান ও জৈব কার্বন প্রভৃতিও নদী মাধ্যমে মোহনা ও তটভূমির জলে আসে।

অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান উদ্ভিদ (Phytoplankton) সমুদ্রে বা তলদেশে থাকে। মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত ও বিষাক্ত শৈবাল জৈববস্তুর

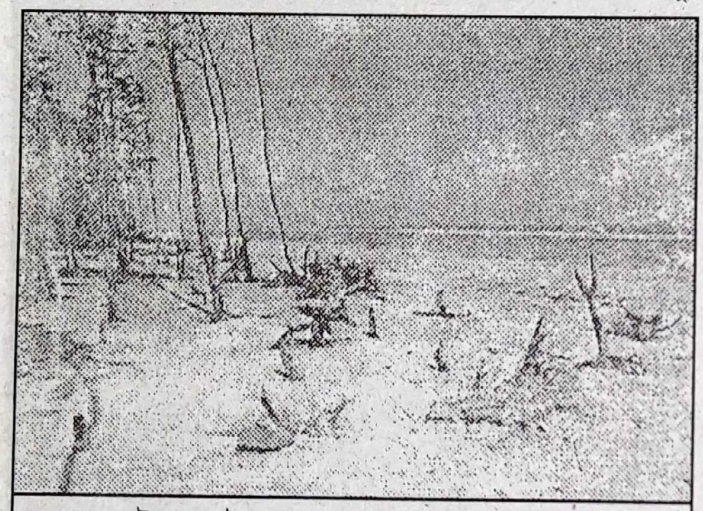

সমুদ্র তটে গাছ কাটা

অতিরিক্ত মাত্রা বাড়ায় এবং অবশেষে অক্সিজেন ঘাটতির জন্য (Anoxic Condition) মৎস্য মারা পড়ে। কিছু কিছু ক্ষতিকর শৈবাল বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে। শিল্প কারখানার দিকে অকালে দূষণ আরও বেশি দেখা যায়।

শিল্প কারখানা ঃ— শিল্প কারখানা থেকে বহু দূষিত পদার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করে নদী মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী স্থল ভাগ থেকে। এই কারণে মোহনা ও তটভূমিতে বেশি দেখা যায়। ফলে ঐ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র-এর পরিবর্তন সাধিত করে। এছাড়া জাহাজও কোন কোন তটভূমি থেকে দূষিত পদার্থ আসে বা খুবই বিষাক্ত ও খুবই ক্ষতিকর। সমুদ্রের নিকটবর্তী বালিয়াড়ি ঘেরা লবনাক্ত জলের ক্ষেত্রে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশে বিক্রিয়া ঘটায় যা জীবজগতের ক্ষতি সাধন করে। পরিবেশ নানা ভাবে গ্যাস, তরল এমনকী কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় এবং উদ্বায়ী ধর্ম অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়ে। লিপিড (এক ধরণের ফ্যাট) এর রাসায়নিক বস্তু বিভিন্ন প্রকার জীবদেহে জমা হয়। সব কিছু নির্ভর করে সমুদ্রে বায়ু, জোয়ার ভাটা, স্রোত, জীবের গমনাগমনের উপর এবং ডাঙার জল ও নদীর মাধ্যমে। আরো কিছু কিছু কারণে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় যেমন আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া, ফলে নানা প্রকার জীবতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে।

জীবের দেহকোষ কলা পরীক্ষ করে দূষিত পদার্থর পরিমাপ করা যায়। কতটা দূষিত পদার্থ দেহে জমা হয়েছে তার অনুপাতও। এই দূষিত পদার্থ সমস্ত জীবসহ মানব দেহে ক্ষতিসাধন করে। তথ্য সূত্রে জানা যায় জীব যা খায় তার চাইতে তাদের দেহে অনেক বেশি দূষিত পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলি বিপাক ও রেচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। জৈব কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ প্রায় ৭০ লক্ষ (Persistant Organic Compound - POCS) এবং এগুলির কিছু কিছু অন্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন বস্তু তৈরী করে সামুদ্রিক পরিবেশের মেরুদন্ডা ও অমেরুদন্ডী প্রাণীর বিপাক ও শারীরবৃত্তির ক্রিয়ায় ক্ষতি করে। সাধারণত সব POCS বিষাক্ত ও স্থায়ী। যথা Halogenated Hydrocarbons সমুদ্রে ফরভূত ক্ষতি করে। Chlorine, Iodine, Fluorine, Bromine তে Halogen আছে। এগুলি স্বল্প মেরুত্ব (Polarity) ও জলে স্বল্প দ্রবীভূত। গন্ধযুক্ত পদার্থগুলি (Aromatic Compounds) বেশি বিক্রিয়া করে এবং রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন Transformation এর সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং এগুলি কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারী DDT-DDE ও Polycyclic এবং Aromatic Hydrocarbons যদিও PCBs ব্যবহার নিষিদ্ধ তবুও অজানা কোন দিক থেকে এই PCBs (Poly Chlorinated Bi Pheny) ব্যবহার হচ্ছে যেমন কগজ শিল্পে পূর্ণব্যবহার উপযোগী কাগজ তৈরীতে কাগজ মন্ডে (Pulp) যা নদীর স্রোতের অভিমুখে পড়ে সমুদ্রে আসে ও সামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষতি করে কিন্তু (PCBs) পাখির ডিমও মানুষের মেদের ক্ষতি করে।

অ্যানথ্রোপোজেনিক রাসায়নিক পদার্থ বন্য প্রাণীদের ক্ষতি করে। জনন হরমোন প্রস্তুত প্রনালী সুরক্ষিত থাকে না।

ধাতু ঃ— ভারী ধাতু প্রকৃতিজাত এবং কখনও ভঙ্গুর নয়, সেগুলি বিষাক্ত নয় কারণ ঘনীভূত, কিন্তু খুবই ক্ষতিকর Cation রূপে। সালফার ও ক্যাটায়ন এর মধ্যে আকর্ষণ বেশি। এগুলি সামুদ্রিক জীবদেহে জমা হয় এবং দূষণ ঘটায়।

জাপানে ১৯৫৩ সালে মিনামাতা উপসাগর ও ১৯৬৫ সালে নিগাতা দ্বীপে পারদ-দূষণ তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের (মৎস্যজীবিদের) মধ্যে

এরপর 3 পাতায়

কোস্টাল পলিউশন ও ইরোসন

2 পাতার পর

মারাত্মকভাবে স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করেছিল যার পরিণতি মৃত্যু। এই জলই সমুদ্রের জলে এসে পড়ে ও মোহনা অঞ্চল দূষিত করে তোলে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঃ— বর্তমানে কোস্টাল ওয়াটারে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখা যায়। যা প্রাকৃতিক ও মানুষের মধ্যে নানা প্রকার কার্য পদ্ধতির ফলে। যেমন তেল পুড়িয়ে যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে। স্থল ভাগে কলিয়ারি, নিউকিয়ার শক্তি পুনঃ উৎপাদনের জন্য নির্গমন মাধ্যমে এবং পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের জন্য বায়ুবাহিত তেজস্ক্রিয় কণা সমূহ ও দূর্ঘটনা হেতু, চিকিৎসার জন্য পরীক্ষা, থেরাপি খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্রভৃতি। সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্রে নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র ও ইলেকট্রিক শক্তির উৎপাদনের জন্য বর্জ্য পদার্থ পড়ে ১৯৪৪ সাল থেকে। নিউকিয়ার যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষার জন্য পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ বা জমা হওয়ায় পরিবেশ নষ্ট হয় ও ১৯৮৫ সালে চেরনোবিলে নিউক্লিয়ার দূর্ঘটনা ঘটে।

কোস্টাল ভূমিক্ষয় ঃ— ভূমি ও তটভূমি স্থানান্তরণ খিতিয়ে থাকা বালিয়াড়ি ক্ষয় হয় হঠাৎ বড় ঢেউ, জোয়ার ভাটার স্রোত, তরঙ্গ প্রবাহ, ড্রেনেজ ও উচ্চ গতি সম্পন্ন বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা কোস্টাল ইরোসন হয়ে থাকে। প্রচন্ড প্রাকৃতিক দূর্যোগ, তীব্র বায়ুপ্রবাহ ও তীব্রগতি সম্পন্ন মোটরযান ভূমি ও তটভূমি ক্ষয় করে। কিন্তু তলানি ও শিলা ক্ষয়ে সময় বেশি লাগে ক্ষয় করতে। সেগুলি ক্ষয় হওয়ার পর কাছাকাছি অস্থায়ীভাবে জমা হয়, একে Coastal Morphodynamics চর্চা বলে। ভূমিক্ষয় হয় জলক্রিয়া Hydrautic action, ঘষে ছড়ে যাওয়া Abration ও উপরি ভাগে রাসায়নিক ক্ষয় Corrotion দ্বারা। কোমল অঞ্চল কঠিন অঞ্চল অপেক্ষা দ্রুত ক্ষয় হয়। যার ফলশ্রুতি বিশেষ ভূমি গঠন, টানেল, ব্রীজ, কলাম ও পিলার গঠন করে। আরো ক্ষয় দৃষ্ট হয় ক্রমাগত ঘষায়, আলগা বালি ও নমনীয় শিলা হওয়ায়। অসংখ্য ক্ষুদ্র, ক্ষদ্র বালুকণা বায়ুপ্রবাহে অপসারিত হয়ে বালুঝড় সৃষ্টি করে। ফলে মসৃণ ও চকচকে শিলার গঠন নষ্ট করে।

দক্ষিণবঙ্গে বঙ্গোপসাগর সমুদ্রতীরে (দীঘা, মান্দারমনি, শংকরপুর, জুনপুট প্রভৃতি) পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠায় ঐ সব স্থানের ঝাউ প্রভৃতি গাছ কেটে ঘর বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়েছে এবং শহরও গড়ে উঠেছে। ফলে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ, ঝাঁড়াঝাড়িবান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলস্ফাতি তীর ছাপিয়ে পর্যটন কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় এবং জল সমুদ্রে ফিরবার সময় স্থলভাগ থেকে বালি ও মাটি টেনে নিয়ে যায়। ঝাউ জঙ্গল থাকলে তা বেশ প্রতিহত হত, এত ক্ষয় হতো না। পর্যটকদের গাড়ি চলাচলের ফলে বালি আলগা হয়।

সমুদ্রধারে বোল্ডার ইত্যাদি ফেলে সেই ভয়াবহ জলস্ফাতি থেকে ক্ষয়কে যথেষ্ট রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে।

তটভূমির বালি শুকনো হয়ে তীব্র বাতাসে যাতে উড়ে না যায় সেজন্য প্রকৃতির সুন্দর ব্যবস্থা লাল কাঁকড়া তটভূমি সংলগ্ন ডাঙাতে গর্ত করে দলে দলে বাস করে। জোয়ারের সময় বা জল যখন নানাকারণে বাড়ে সেই সময় ঐ গর্তে জল বেশ ভেতরের দিকে চলে যায় ও বালি ভিজিয়ে দেয়। জলকণা ও বালুকণার অসম সংযোগে Adhesive Force এর জন্য বালুকণা জমাট হয় ও উড়ে যায় না। এ পারস্পরিক উপকারের দৃষ্টান্ত।

জুনপুট ও শংকরপুরে ট্রলার ও নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরা হয়। মাছের সঙ্গে নানাপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী ধরা পড়ে। মাছগুলিকে শুটকি হিসাবে ব্যবহার করে ও অন্যান্য প্রাণীগুলিকে তটভূমিতে ফেলে দেয়। ঐ শুটকির জন্য মাছগুলিকে তটভূমিতে শুকোতে দেয় যা জুনপুটে দেখা যায় ও শংকরপুরে দড়ি টাঙ্গিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। ঐ শুটকি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তটভূমির বায়ু বিষাক্ত করে তোলে। তার উপর তো ফেলে দেওয়া অন্য প্রাণীর দুর্গন্ধ আছেই।

তটভূমির পাশাপাশি ফিসারীতে (চিংড়ি চাষ) মাছের ওজন দ্রুত বাড়াবার জন্য তাদের খাবারের সঙ্গে সীসার মত ধাতু মিশ্রিত করা হয়। যখন কোন কারণে চিংড়ির মড়ক হয় সে সময় জল দূষণ ঘটে ও সেই জল নদী-নালার মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তাই সুপ্রিম কোর্ট সব চিংড়ি প্রকল্পের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় বেশ কয়েক বছর পূর্বে জাপানের মিনমাটাতে চিংড়ির মাথা খেয়ে ১৪,০০০ জীবন অকালে গেল। দুঃখের বিষয় তথাপি এই রাজ্যের বেশ কিছু ফিসারি ১৯৭৪ সালের জল আইন ভঙ্গ করে দূষণ ছড়িয়ে বিপদ ডেকে আনছে।

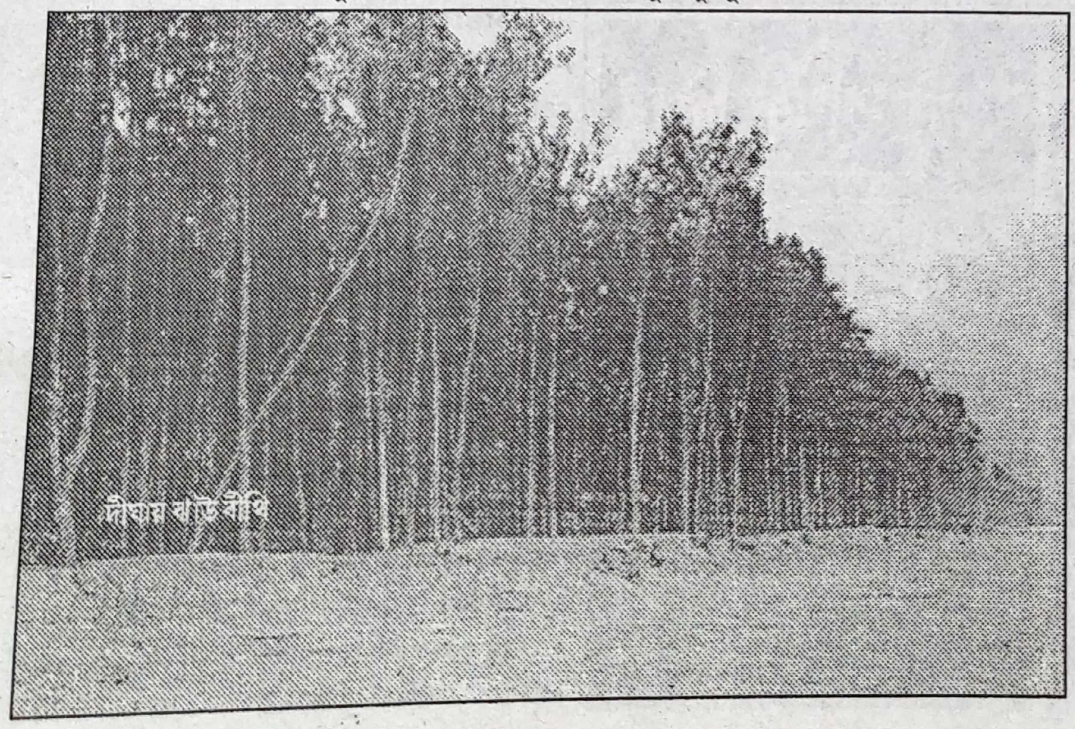

দীঘায় ঝাউ বীথি

প্রকৃতির ক্ষয়-ক্ষতি অনিবার্য। তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবুও নিজেরা সচেতন হলে কিছুটা সুরাহা সম্ভব। মানুষ সেদিকেই তাকিয়ে। আমরা চাই দূষণ মুক্ত পৃথিবী।

লেখক ঃ কাননকুমার প্রামাণিক, নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর,
চলভাষ ঃ ৯৪৩৪৩৬৯৬৬১।
Email
kanankumar1942@gmail.com

ছবি ঃ কমল কুমার প্রামাণিক

ক্যালোরি মুক্ত মিষ্ট কারক

1 পাতার পর

বা ক্যালোরি উৎপন্ন করে না। তাই এদের ক্যালোরি মুক্ত মিষ্ট কারকও বলা হয়।

বাজারে যে সমস্ত বহুল ব্যবহৃত কৃত্রিম মিষ্ট কারক পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলি হল স্যাকারিন, অ্যাসপারটেম, অ্যালিটেম, সুক্রালোজ, সাইকামেট, এল-গ্লুকোজ ইত্যাদি। কিন্তু এরাও মানবদেহের পক্ষে কতটা নিরাপদ? মিষ্টকারক পদার্থের ইতিহাস কোন কথা বলে? এসবই এখানকার আলোচনার মূল বিষয়। স্যাকারিন (বাজারে যা Sweet'N Low, Swet Twin নামে পরিচিত) হল প্রথম ব্যবহৃত কৃত্রিম মিষ্টকারক পদার্থ যা জলে অদ্রাব্য হওয়ায় একে জলে দ্রাব্য সোডিয়াম বা ক্যলসিয়াম লবন রূপে ব্যবহার করা হয়। এর মিষ্টত্ব চিনির প্রায় ৫০০ গুন এবং কোনো ক্যালোরিফিক্ ভ্যালু নেই। মুত্রের মাধ্যমে এটি অপরিবর্তিত অবস্থায় শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগী এবং যাদের ক্যালোরি অর্ন্তগ্রহণ কম করা দরকার তাদের পক্ষেএটি উপযুক্ত মিষ্টকারক। কিন্তুএই স্যাকারিন কতট নিরাপদ এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং দেখা গেছে এর ক্রমাগত ব্যবহার ক্যান্সার রোগ ঘটাতে পারে। Fukushima etal. (1983) তাদের গবেষণায় প্রমাণ করেছে ঘন ঘন স্যাকারিন যুক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণে ইউরিনারী ইনফেক্সন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। সাকারিনের হেপ্টাটক্সিসিটি এবং লিভারের পচনের মতো রোগের কথা ১৯৯৪ প্রথম উল্লেখ করেছেন Negro Mondardini and Paldmas এই প্রসঙ্গে বলা ভালো Pregnant বা lactating মহিলাদের কোনো অবস্থাতেই স্যাকারিন গ্রহণ করা উচিত নয়।

স্যাকারিনের পরে যে মিষ্টকারক পদার্থটির নাম শোনা যায় তাহল অ্যাসপারটেম। ১৯৯৬ সাল থেকেই এটাকে খাদ্য দ্রব্যে এবং পানীয়তে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে FDA (Food and Drug Administration)। বাজারে এই রাসায়নিক পদার্থটি Equal এবং Nutrasweet নমে পরিচিত। মৃদু পানীয়। চুইংগাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের মেডিসিন সর্বত্রই এটা ব্যবহৃত হয়। অ্যাসপারটেম এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেক মতবাদ অনেকে দিয়েছেন। অ্যাসপারটেম যুক্ত খাবার গ্রহণের পর এটা অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, ফিনাইল অ্যালানিন এবং মিথানলে পরিণত হয়। অ্যাসপারটেম বা অ্যাসপারটেমের আদ্র বিশ্লেষণের ফলে প্রাপ্ত পদার্থগুলো কোনটির শরীর গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে ফিনাইল কিটোন্ ইউরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের এটি গ্রহণ করা উচিৎ নয়। FDA এর ব্যবহারের উচ্চমাত্রা সঠিক ভাবে এখনো বেঁধে দেয়নি। তাই যেসব খাদ্যে এর পরিমাণ অতিরিক্ত বেশী বা যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত অ্যাসপারটেম যুক্ত খাবার বা পানীয় বা মেডিসিন নিয়ে চলেছে তাদের মাথা ধরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সচেতন মানুষ অ্যাসপারটেম এর ব্যবহার কমাচ্ছে তার পেছনে প্রধান দুটি কারণ হল, কোলেস্টেরল বাড়ানো, শরীর থেকে বডি ফ্লুইড কমে যাওয়া।

সাইকামেট্ (Brand Name Sugar Twin, Sucaryl) যা ১৯৭০ সালেই FDA এটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ গবেষণায় ধরা পড়েছে এটা Bladder Cancer এবং Testicular attropy-র জন্য দায়ী।

নিওটেম্ অপর একটি মিষ্টকারক পদার্থ যা সাধারণত jem, jellies, fruit juice, buked goods এ ব্যবহৃত হয়। মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণে মাথা ধরা এবং heptatoxic হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণে, শরীরে ওজন যেমন অতিরিক্ত কমিয়ে দেয় ঠিক তেমনি birth rate ও কমাতে পারে। সুক্রালেস্ সুগারের থেকে ৬০০ গুন বেশী মিষ্টি যুক্ত পদার্থ। ১৯৯৮ সালে FDA এটাকে ১৫টি খাদ্যে ব্যবহারের স্বীকৃতি দিয়েছে। সুক্রোজের তিনটি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে এটা বানানো হয়। এর অধিক গ্রহণে সাধারণত shruken thymas gland's এ প্রভাব পরে বলে অনেকে মনে করেন।

এই আলোচনার শেষে বলা যায় যদিও আজকার কৃত্রিম মিষ্টকারক পদার্থের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। যতই এদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভিন্ন মতবাদ থাকুক, আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে আমরা নিজেরা কোনো সমস্যায় পড়ছি কিনা।

Reference : American dietetic Assoiation (2004). Journal of the American Dietetic Association, 104 (2), 255-275, AAOHN Journal, June 2008, Vol-56, No-6

লেখক ঃ ড. তপন দাস, গোসানীমারী হাইস্কুল (উঃমাঃ), কোচবিহার। মোঃ-৯৪৩৪৬৮৬৭৪৯।

Email : tdnu@rediffmail.com

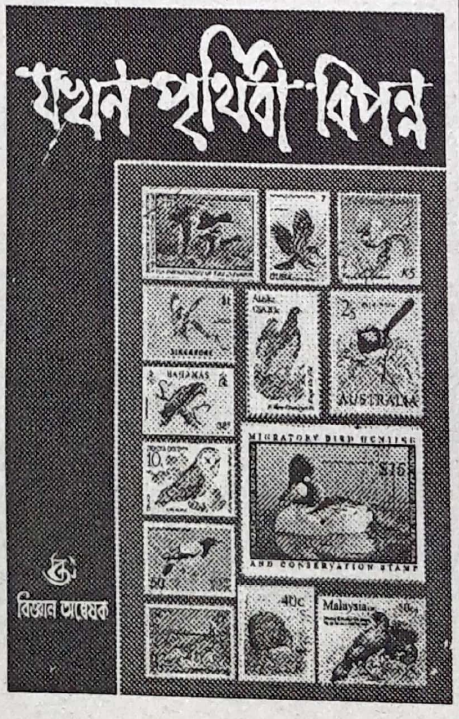

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বই প্রকাশ

১৮ই জানুয়ারী ২০১৫ মোহনপুর নদী বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞান দরবারের ব্যবস্থাপনায় এক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে যখন পৃথিবী বিপন্ন বইটি প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সম্পাদিকা সুপ্রিয়া রায়।

পাগলা কুকুর থেকে সাবধান!

সাধারণ ভাবে কুকুর কারুর কাছে শখের, আবার কারুর কাছে ভয়ের। কিন্তু পাগলা কুকুর সকলের কাছেই ভয়ের। শুধু পাগলা কুকুর কেন, পাগল যে কোন প্রাণীই ভয়ের। বহুরোগ আছে যা প্রাণী থেকে মানুষে ছড়ায়। আবার কিছু রোগ মানুষ থেকেই প্রাণীতে আসে। এদের বলা হয় জুনোটিক রোগ। কোন কোন জুনোটিক রোগ এমন মারাত্মক যা প্রাণসংশয়ের কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এরকম একটি মারাত্মক জুনোটিক রোগ হলো 'জলাতঙ্ক'। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। একবার আক্রান্ত হলে মৃত্যু অবধারিত। সাধারণত রোগাক্রান্ত প্রাণী কামড়ালে, আঁচড়ালে বা কাটা বা ছড়ে যাওয়া জায়গায় তার লালা লাগলে এই রোগ সংক্রামিত হয় (আমাদের রাজ্যে রোগাক্রান্ত কুকুরের কামড় থেকেই মানুষের এই রোগ হয়)। আমরা এই রোগাক্রান্ত কুকুরকে অনেক সময় 'পাগলা কুকুর' বলে থাকি। কুকুর ছাড়াও পাগলা বিড়াল, বানর, গরু, মহিষ, শূকর, ছাগল, ভেড়া, শেয়াল, নেকড়ে, ঘোড়া, উট, খরগোশ, ইঁদুর, গিরগীটি, হরিণ, বঘ, সিংহ প্রভৃতি থেকেও রোগটি মানুষে আসতে পারে। কুকুরের এই রোগের ব্যাপারে একটা কথা জানা দরকার - তা হলো, যদি কোন কুকুরের এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে সেই কুকুরের পক্ষে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সাধারণত দিন দশেকের মধ্যেই আক্রান্ত কুকুর মারা যায়।

এই রোগটিতে কুকুর আক্রান্ত হলে সাধারণত দুরকমের লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমক্ষেত্রে, কুকুর ক্ষিপ্র হয়ে উঠে, দৃষ্টি অস্বাভাবিক হয়, উদ্দেশ্যহীন ভাবে দৌড়ায়, হঠাৎ তাড়া করে অকারণে মানুষ বা পশুকে কামড়ায়, গলার স্বর ভেঙ্গে যায়, খুব লালা ঝরে, কিছুই গিলতে পারে না, শেষে পক্ষাঘাত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কুকুর অস্বাভাবিক ভাবে শান্ত হয়ে সকলের কাছ থেকে লুকাতে চায়। অন্ধকার জায়গা বেশি পছন্দ করে। নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ে। কিছুই খেতে পারে না। মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। গলায় কোন শক্ত জিনিস আটকে গেলে যে রকম অস্বাভাবিক শব্দ করে বের করবার চেষ্টা করে, কুকুর ঠিক সেই রকম করতে থাকে।

পাগলা কুকুর কামড়ালে ক্ষতস্থানে কখনই অ্যাসিড জাতীয় কোন বস্তু লাগাবেন না। এতে ক্ষতি বেশী হয়। কুকুরের কামড়ানো ক্ষতস্থান খোলা রাখুন। যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কুকুরকে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের জন্য এখনই আপনার কুকুরকে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিষেধক টীকা দেবার ব্যবস্থা করুন। কুকুরের জন্য অতি আধুনিক ভাবে তৈরী জলাতঙ্ক রোগের টীকা দেবার ব্যবস্থা আছে। আপনার কুকুরকে এই টীকা দেওয়ার জন্য কাছাকাছি সরকারী প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনে রাখবেন ঃ—

১) জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার থেকে এই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা বহুলাংশে সফল। ২) সব পশু থেকেই মানুষের জলাতঙ্ক রোগের সম্ভাবনা আছে। ৩) কোন কুকুর তা রাস্তারই হোক বা বাড়ীরই হোক, মানুষকে কামড়ালে কখনই কুকুরটিকে মেরে ফেলা উচিত নয়। কম করে কামড়ানোর পর ১০ দিন পর্যন্ত দেখা দরকার। ৪) মানুষকে কুকুরে কামড়ালে ক্ষতস্থান ভালভাবে যতশীঘ্র সম্ভব কাপড় কাচা সাবান জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে দেওয়া দরকার। তারপর যতশীঘ্র সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুয়ায়ী প্রতিষেধক টীকা (Anti Rabis Vaccine) দিতে হবে।

৫) সরকারী নিয়মে আপনার পোষা কুকুরের লাইসেন্স করা অত্যন্ত জরুরী। পোষা কুকুরকে নিয়মিত টীকা লাগান।

কৃতজ্ঞতা ঃ পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়।

চাকদহ বইমেলা

চাকদহ পৌরসভার উদ্যোগে ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর ২০১৪ এক দারুন বইমেলা অনুষ্ঠিত হল চাকদহ শ্যামাপ্রসাদ ময়দানে। এই ছোট্ট মাঠে ৪৮টি বড় বুক স্টল আর ১১টি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল ছিল। বইমেলা উদ্বোধন করেন ছোটোগল্প লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্ত্তী, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, উজ্জ্বল বিশ্বাস ও জেলা সভাধিপতি বানী রায় উপস্থিত ছিলেন। দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে কোনো কাজ করলে সে কাজ যে সুন্দর হয় চাকদহ বইমেলা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের কোনো বুক স্টল ছিল না। চাকদহের সমস্ত মানুষ অভিভূত এই বইমেলায়। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দর্শণের বই প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকার ওপর বিক্রি হয়েছে। যা জেলার মেলায় হয় কী না তা নিয়ে সংশয় আছে। 'উন্নয়ন ও পরিবেশ' নিয়ে রবীন্দ্র কক্ষে এক অসাধারণ বক্তৃতা করেন সমর বাগচী। বাংলার দেশীয় পাখির ওপর ছবি দেখিয়ে আলোচনা করেন বিজ্ঞান দরবারের কর্মী সম্রাট সরকার। শুরুতে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খালি গলার গান সভা মাতিয়ে দেয়।

উৎস মানুষ, বি-সংবাদ, বিজ্ঞান অন্বেষক, জ্ঞান-বিচিত্রা, বই-কারিগর, সাথে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার বিজ্ঞানকর্মীরা মেলাতে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী বছরে ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তে মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির চক্ষুদান ও দেহদান অঙ্গীকার উৎসব

চাকদহে ২৭-১২-২০১৪ রাধাকৃষ্ণ মার্কেট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি 'সিংহের হাট' এর ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীগন এক অসাধারণ কাজ করে ফেললেন। যাঁরা সমাজ থেকে শুধু গ্রহণই করেন তাঁরা রক্তদান, দেহদান ও চক্ষুদান উৎসব হিসেবে পালন করলেন। বিধায়ক রত্না ঘোষ এবং চাকদহ পৌরসভার পৌরপ্রধান দীপক চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মূল কারিগর সুবল দেবনাথ এবং গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের সুপার নিরুপম বিশ্বাসকে চাকদহের বহু মানুষ স্বাগত জানান। কাব সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন এই ধরণের কাজ করে থাকেন কিন্তু ব্যবসায়ীক সংগঠন এ ধরণের কাজ করছেন তা চাকদহের বুদ্ধিজীবীগনকে অবাক করেছে। ১০ জন চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন ও ৮জন দেহদানের অঙ্গীকার করেন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এইভাবে দেহদান ও চক্ষুদান আন্দোলনে যোগ দিক আমরা চাই।

আমরা যা খাই

হরিদ্রা (হলুদ)

নামান্তরে-অসমীয়া - হলোধি, বাংলা হলুদ ইংরেজী Turmeric গুজরাতি - হলদ, হিন্দী - হলদি, কন্নড় - অড়িসিনা, মালয়ালাম - সনজেলাকুয়া, মনল, মারাঠী - হলেছে, ওড়িয়া - হলদি, তামিল - মনজাল, তেলুগু - পাড্ডপু।

নামকরণ ও প্রাপ্তি স্থান ঃ বর্ষজীবি এই কন্দটিতে একটি রাসায়নিক পাওয়া যায় তার নাম কারক্যুমিন। কন্দটি লম্বা ধরণের তাই Longa আর ঘরে ঘরে তার ব্যবহার তাই Domestica অপরদিকে বলতে পারেন যেহেতু উপকারী রাসায়নিকটি Curcuma তে পাওয়া যায় তাই Curcumin।

প্রজাতিটিকে ভারতের সবর্বত্রই চাষ করা হয়। বিশেষ করে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে। একদল উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতে এটি ভারতের নিজস্ব সম্পদ আর একদল বলেন এটি চীনের। যখন সুশ্রুত সংহিতাতেই হরিদ্রার কথা লেখা রয়েছে একে ভারতীয় উদ্ভিদ বলার যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই আছে। তাছাড়া সম্প্রতি আমেরিকার পেটেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে ভারতের কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ জয়লাভ করাতে এটা যে ভারতের নিজস্ব সম্পদ তা আইনত প্রতিষ্ঠিত তথ্য।

পরিচিতি ঃ হলুদ বর্ষজীবি কন্দ। গাছের উচ্চতর ৫০-৬০ সেন্টিমিটার। কান্ড ছোট, পাতা বল্লমাকার গুচ্ছবদ্ধ। কন্দ হলদেটে। ফুল হলদে আর এর ঔষধিমূল্য অপরিসীম।

গুনাবলী ঃ কফ, পিত্ত, রক্তজ পীড়া, শোথ, গাত্রকন্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, পান্ডু এবং ধননাশক। বয়স যদি চল্লিশের কোঠায় তাহলে খাওয়া দাওয়াকে হলুদের পরিমাণ একটু বাড়াতে পারেন। কাঁচা হলুদ খাওয়া অভ্যাস করতে পারেন। হলুদ আপনাকে স্মৃতিভ্রংশ রোগ হওয়া থেকে বাঁচাবে।

হলুদ একটি আয়ূর্বেদীয় ঔষধ। তাছাড়া হিন্দুদের যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে হলুদের প্রয়োজন। আর ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে দুধ আর হলুদ বাটা রূপ টান হিসাবে ব্যবহার্য্য ছিল।

হলুদের রাসায়নিক সংযুতি ঃ প্রতি ১০০ গ্রাম হলুদে থাকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা ৬৩ গ্রাম, প্রোটিন ৮.৬ গ্রাম, ফসফরাস ০.২৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.২ গ্রাম, লৌহ ০.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ২.৫ গ্রাম, সোডিয়াম ০.০১ গ্রাম, ভিটামিন এ ১৭৫ আই ইউ, ভিটামিন বি (থায়ামিন) ০.০৯ মিলি গ্রাম, বি২ (রিবোফ্লাভিন) ০.১৯ মিগ্রা, ভিটামিন সি ৪৯.৮ মিগ্রা নিয়াসিন ৪.৮ মিগ্রা আর মোট ক্যালোরি মূল্য ৩৯০।

ঔষধি মূল্য ঃ সব রান্নাতে হলুদ দেওয়া হয় তার কারণ হলুদ খাবারের বিষক্রিয়া ও পচন নিবারণ করে খাবার আগে পর্যন্ত। সুশ্রুত সংহিতাতেই এই গুনের কথা জানা যায়।

হরিদ্রা স্বরসে তিক্তা রুক্ষেন বিষকুষ্ঠনুত্
মেহকন্ডু ধ্রনাম হন্তি দেহবর্ণ বিধায়িনী;
বিষোন্মিনী কৃমি হরা পীনাসারুচিনাশিনী।

নানা রোগে হলুদের ব্যবহার ঃ—

রক্তাল্পতায় - হলদি গুড়া, ত্রিফলাচূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহযোগে খেতে হয়।

ক্ষত স্থানে - হলদি বাটা লাগানো জীবানুনাশক হিসাবে কাজ করে।

শুষ্ক কাশিতে - হলদি গুড়া, বাসক পাতার রস এবং মাখন মিশিয়ে খেলে আরাম দেয়।

মচকানো ব্যথায় - চুন, হলুদ ও একটু লবন মিশিয়ে অল্প গরম করে লাগাতে হয়। তাতে ব্যথা কমে, ফোলাও কমে যায়।

চর্ম্মরোগ ও চুলকানিতে - ৩-৫ গ্রাম শুকনো হলুদের কন্দ গুড়ো করে ঘৃত এবং মধু সহ গায়ে লাগালে সেরে যায়। ব্যবস্থাপত্রটি চিকিৎসা মঞ্জুরীর।

মেহরোগে - চরক সংহিতায় আছে যদি ১০ গ্রাম হলদি চুর্ণ ১০ গ্রাম আমলকী চুর্নের সঙ্গে মিশিয়ে খালিপেটে নিয়মিত খান তাহলে মেহরোগীরা ভাল থাকবেন।

আরও কিছু স্বাস্থ্য বিধান - কাচা হলুদ ও নিমপাতা বেটে সর্ষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার গায়ে মাখলে অধিকাংশ চর্ম্মরোগ সেরে যায়। ছেলেবেলায় এর বহুল প্রমাণ দেখেছি।

আর একটা জিনিস দেখতাম চোখ ওঠা রোগের ক্ষেত্রে। কাঁচা হলুদ জলে সিদ্ধ করে সেই জল ঠান্ডা করে তা দিয়ে চোখ ধুলে কষ্টের উপশম হয় আর ওই জলে রুমাল ভিজিয়ে সেই রুমাল দিয়ে পিঁচুটি মুছলে অনেকটা আরাম পাওয়া যেতো। যেহেতু হলদি একটি অ্যান্টিসেপটিক তথা অ্যান্টিবায়োটিক।

এক টুকরো কাঁচা হলুদ অল্প আখের গুড় দিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে যকৃত ঠিক থাকে। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায়। হলুদ খাওয়ার ফলে পাকস্থলিতে পাচক রস বেশী ক্ষরিত হয় তাই হজম ক্ষমতাও বেড়ে যায়। আর হলুদ অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হওয়ার কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

একটা কথা না বললেই নয়। হলদি বাটাতো আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তার পরিবর্তে ব্যবহার করছি সুন্দর প্যাকেটের গুড়া হলুদ যা সাধু ভাষায় হরিদ্রা চুর্ণ। এতে অবশ্য কী পরিমান রং করা অ্যারারুট বা পচে যাওয়া চাল, ডালের গুড়া থাকে তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তাইতো বলি যকৃত ঘটিত রোগের এত বাড়াবাড়ি কেন !

লেখক ঃ- প্রণবেশ কুমার চৌধুরী, চলভাষ - ৯৯৩২৩৯১৯০৪

আলিপুরদুয়ার, নেচার ক্লাব, নিউ টাউন, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, পিন-৭৩৬১২২

প্রকৃতি রক্ষায় সাইকেল র‍্যালি ঃ বিজ্ঞান দরবারের ব্যবস্থাপনায় ও অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের সহযোগিতায় ২২ মার্চ রবিবার ২০১৫ মথুরা বিল, কুলিয়া বিল, বয়সা বিল (মোট ৩০টি জলাশয়) বাঁচাও এবং প্রকৃতি রক্ষায় এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হবে। সকাল ৭টায় কাঁচরাপাড়া স্টেশনে ত্রিকোণ পার্কে জমায়েত, পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা সহ সারা দিনের প্রচার অভিযান। সকলের অংশগ্রহণ কাম্য।

প্রসঙ্গ: পরিবেশ

1 পাতার পর

এই প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে জড়িয়ে যে পৃথক একটি উপাদানের চরিত্রগত, গুনগত অবস্থান বদলের খোঁজ করা দুঃসাধ্য। আর্থিক উন্নয়নকেই জীবনের মনোন্নয়নের মূল ও প্রধান শর্ত হিসেবে জোর দেওয়ার প্রবণতা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রয়াস শুরু হল জি এন পি বা মোট জাতীয় উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলার। এরই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ নিয়েও শুরু হল ব্যাপক আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা। বদলে গেল পুরোনো পরিবেশগত ধ্যান-ধারণা। আগে ভাবা হচ্ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে না ভেঙ্গে আর্থিক প্রগতির ধারা পরিবর্তিত করা যায়, যাতে উৎপাদন সম্প্রসারিত হবে এবং উন্নয়নও আসবে। বিশ্বায়ন যা কিনা নয়া সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক আগ্রাহসনমুখী নাম, হিসেবটাকে বদলে দিল অনেকখানি। জি এন পি বাড়ানোর প্রধান এবং প্রথম ধাপ হল উন্নয়ন। যদিও এই উন্নয়নের মানে দাড়াল সমাজের সকল স্তরে সবার জন্য উন্নয়ন নয়া উন্নয়নের মডেল ঘিরে নানা বির্তক, নানান প্রশ্ন। কিন্তু উন্নয়ন হোক বা না হোক, কার্যত এটাই ভীষণ-ভীষণ ভাবে সত্যি হয়ে উঠল। আর্থিক প্রগতির ফলে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে - যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ-ই শুধু নয়, মানব সম্পদও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বসেছে। আর্থিক উন্নয়নই যে জীবনের মামোন্নয়নের মূল শর্ত নয়, একথা অনেকেই মানেন। আবার অনেকেই মনে করেন জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আংশিক ভূমিকা পালন করে মাত্র। বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ আর্থিক প্রগতির ফলে হারায় অনেক কিছু, বদলে যায় সমাজ-সংস্কৃতি। মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি সরাসরি পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, নির্ভরশীল।

দেখা গেল তথাকথিত উন্নয়নের মূল্য দিতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি-পরিবেশকেই। ক্যাসিক্যাল অর্থনীতির মডেল অনুসারে (যেখানে প্রকৃতিকে দেখা হয় একটি 'ন্যাচারাল ক্যাপিটাল' হিসেবে), সমস্যা ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছে। জমি, নদী প্রাকৃতিক পুঁজি হলেও এর কিছু সাধারণ সংযোগ রয়েছে ভৌত পুঁজি ও শ্রমের সঙ্গে। কিন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব (মূলত বেকনের মতবাদ) অনুযায়ী এই সাধারণ সংযোগটিকে অস্বীকার করা হল এবং প্রাকৃতিক পুঁজির সম্পদ নদীর সরাসরি বিকল্প হিসেবে 'মনুষ্য নির্মিত খাল'-কে ধরা হল। শুরু হল প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার, তাকে জয় করার প্রচেষ্টা আর চলল প্রাকৃতিক পুঁজির অবধ লুণ্ঠন। প্রতিবাদ উঠল এর বিরুদ্ধে।

অর্থনৈতিক মডেলেরে মত্যান্তর থাকলেও শেষ পর্যন্ত যেটা দেখা গেল তা হল পুঁজির অবাধ বিচরণে প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষিত হতে বসেছে। বিপর্যস্ত ইকোসিস্টেম ৬০-র দশকে (১৯৬২) লেখা রাচেল কারসনের বই 'সাইলেন্ট স্প্রীং' পৃথিবী জুড়ে তুলল ঝড়। শুরু হল পরিবেশ ভাবনা। যদিও পরিবেশ ভাবনা নতুন কিছু নয় - বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীনভাবে যুক্ত ছিল। ভারতেও অতীতকাল থেকেই বন-প্রকৃতি সংরক্ষণের দিকটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সংম্পৃক্ত (যদিও মধ্যযুগের পর থেকে তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে আসে)।

ষাটের দশকে পরিবেশ রক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এক সংঘবদ্ধ প্রয়াস দেখা গেল - যা জন্ম দিল পরিবেশ আন্দোলনের। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ আন্দোলন মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবিয়েছে। বদলে দিয়েছে অনেক কিছুই। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। বেশিরভাগ মানুষই চান আর্থিক উন্নতি ও পরিবেশ সংরক্ষা। উন্নতি এবং পরিবেশ - এদুটো বিষয়কে একই সঙ্গে পেতে হলে আমাদের পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটিতে জোর দিতেই হবে।

নিজে ভালো থাকার জন্য, প্রকৃতি জয় করার নামে এই যে উদ্ধতবাদ - এতেই তো হারিয়ে গেল হাজার হাজার প্রজাতি। যাচ্ছেও প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমাদের চাহিদার শেষ নেই। চারিদিকে কত ঘটনা। তা আমাদের মানবিকতা বোধকে বিপন্ন করে কী? নির্বিকার হয়ে পথ চলাই আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের বরফ দ্রুত উধাও হচ্ছে। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী - সব কিছু নিয়েই আমাদের প্রকৃতি পরিবেশ। সবাই থাকবে। মিলেমিশে, একসাথে - এমনটাই ভাবি আমরা। কিন্তু সবাই কি ভাবেন? তাইতো আজ পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত সব পর্বতচূড়া, পর্বতমালা সংকটের মুখে। চাই পাহাড়ের মাথাতেও ফাইভ স্টার ব্যবস্থা। তাহলে আর বিজ্ঞানীদের -বিজ্ঞানের বড়াই কেন বাপু? সারা বছর দিন-রাত নেট ক্লান্ত আমরা একটু আরাম করব বলেই তো আসি। আর এই আসার স্রোতে ভেঙ্গে যাচ্ছে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য-ইকোসিস্টেম। রাস্তা বানাতে গিয়ে পাহাড় ফাটাতে হচ্ছে, কাটতে হচ্ছে গাছ। এতেই দফা-রফা পাহাড়-পর্বতের। নামছে ধস। হিমালয়ের ১০-১২ হাজার ফিট ওপরে কী ভয়ানক হারে গাছ কাটা হচ্ছে এবং হয়েছে। অবিশ্বাস্য! ১৩,০০০ ফিট ওপরে সেলা পাসের কাছাকাছি বিভিন্ন কোম্পানির চিপসের খালি প্যাকেট গড়াগড়ি খাচ্ছে। রাস্তার মাঝে মাঝেই পড়ে রয়েছে প্লাস্টিক। চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে রিসর্ট না বানালে কী, উন্নয়ন আসে না? শুধুমাত্র কিছু মানুষের সুখের জন্য এভাবে ভবিষ্যতের দুঃখ ডেকে আনার আদৌই প্রয়োজন আছে কি?

ভারতে এখন বনভূমির আয়তন প্রায় ৬.৫ কোটি হেক্টর - বা মোট ভূমিভাগের মাত্র ২০ শতাংশ। রয়েছে চল্লিশ হাজারেরও বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি। এই উদ্ভিদের বেশিরভাগটাই উত্তরের হিমালয় পার্বত্য রাজ্যগুলোতেই বেশি। কিন্তু, আমাদের তো চাহিদার শেষ নেই। তাই, ক্রমাগত ব্যবহারে একেবারে শেষ হতে চলেছে অরণ্য - এই পৃথিবীর একেবারে আদি বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথের বালক মনের সেই উপলব্ধি - "বনস্পতিগুলো প্রকান্ড দৈত্যের মতো মস্ত-মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ"। তারও তো গুরুত্ব দেওয়া হল না। পেরিয়ে এলাম কতগুলো বছর, সমস্যার সমাধান হল কী? শেষ হল ২০১৪। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অরণ্যবর্ষও! জঙ্গল, গাছপালা, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য - সব কিছুই আজ বিপন্ন। যতদিন না বনভূমির অর্থনৈতিক দিকটি ছাড়াও এর বাস্তুতান্ত্রিক সুরক্ষার বিষয়টি আমাদের মাথায় ঠাঁই পাবে ততদিন বনভূমি কেবল মুনাফা বাড়ানোর উৎস হয়েই থাকবে। শুধু পরিবেশই নয়-সংস্কৃতিসহ প্রত্নতাত্ত্বিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেও এটি জরুরি। অতীতকাল থেকেই বন-প্রকৃতি সংরক্ষণের দিকটি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সংম্পৃক্ত। কিন্তু সেই সংস্কৃতি এখন খুঁজে পাওয়া ভার! প্রকৃতি-পরিবেশ ধবংস করে এই যে ব্যাপক পরিবর্তন, এরই পরিণামে এসেছে দূষণ। আজ দূষণ জালে - দূষণ বিষে হাঁসফাঁস করছে সকলে। সুস্থ নেই কেউ কোথা!

লেখক ঃ ড. সোমা বসু, মোঃ- ৯৪৩৩৯৪১৭৭৬
Email : bsoma25@rediffmail.com

কোথায় বিজ্ঞান মানসিকতা ?

২০১৪ এর কলকাতা বই মেলা শেষ সাহিত্যের সাথে প্রচুর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশের প্রচুর বই ও পত্রিকা বিক্রি হয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বহু মানুষ কিনেছেন এই সব বই। পশ্চিমবঙ্গ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট সারা শীতকাল ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক মেলা করেছেন স্কুলে স্কুলে, এলাকায় এলাকায়, কাবে কাবে, বহু বিজ্ঞান কাব গড়ে উঠেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু ৫০-৬০ বছরের এই প্রচার সাধারণ মানুষের মনের কোনে এখন পৌঁছায়নি। দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে কু-সংস্কার দূর করবার বড় বড় পোষ্টার এক ফোঁটাও রেখাপাত করতে পেরেছে কিনা তা ২০১৪-য় ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তার প্রমাণ।

অপয়া বউ

তারিখটা ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ মঙ্গলবার ভোর ৬টায় ৫টা গাড়ি করে মালদহ থেকে রায়গঞ্জে ফিরছিল একটি বিয়ে বাড়ির দল এর মধ্যে একটি বোলেরো গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারল একটা ১০ চাকা লরির সঙ্গে, গাড়িতে ১৫জন ছিলেন। সাথে সাথে মারা গেলেন ১৩জন। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের ময়নাভিটার বাসিন্দা গৌতম রাজভরের সঙ্গে বিয়ে হয় বাগানপাড়ার মেয়ে রাধারানের। অগ্নিসাক্ষা করে শপথ নিয়েছেন দুজন সুখে দুঃখে রাধার পাশে থাকবে গৌতম। কিন্তু এই অলক্ষণে অপয়া বৌ-এর জন্যই এই দূর্ঘটনা। গাড়ি থেকে যৌতুক নামিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছে এই অপরা বৌকে কিছুতেই নিয়ে যাব না গ্রামে। আমলটা শরৎচন্দ্রের সময়ের নয়, ২০১৪। যখন মানুষ সারা পৃথিবীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ল্যাপটপ ছাড়া মানুষ ভাবতেই পারে না তখন এই ঘটনা ঘটছে সারা ভারতের সব থেকে প্রগতিশীল রাজ্যে। রাধা গ্রামের মেয়ে সোজাসাপটা আসল কথাটা বলে ফেলেছে। ও বলেছে ভোরবেলা কুয়াশা ছিল। এছাড়া সবাই তো মদ্যপ ছিল। চালকও মদ খেয়েছিল। দোষতো ওদের আর আমি অপয়া হয়ে গেলাম। মন্ত্রী, পঞ্চায়েত, দাদা, থানা ধরে ওকে পাঠানো হয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু ভয় যে থেকেই যাচ্ছে মনের কোনে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যদি রাধার ওপর অত্যাচার করে? রাধার পিসিরা ওকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িতে চেপেছিল। কিন্তু জবরদস্তি এই দুই মহিলাকে নামিয়ে দিয়েছে বর পক্ষ।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিহত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ২ লক্ষটাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান মানসিক বিকাশের জন্য বা এই জঘন্য কু-সংস্কার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। বলেননি অপয়া শুধু বউরা (মেয়েরা) কেন হবে? পয়া বা অপয়া বলে কিছু হয় না।

অবতার মোবাইল

মোবাইল খারাপ হোক আর ভালো হোক এখন শৌচাগার নেই এমন বাড়িতেই এখন মোবাইল আছে। আর এই মোবাইলের দারুন উপকার পেয়েছেন বিহারের বালঘাট জেলার আদিবাসী গ্রামের বাসিন্দা বেনীরাম রঙ্গদালে। গ্রামের পাশে লাগোয়া জঙ্গলে প্রতিদিনই গরু মেষ ছাগল চরাতে যায় বেনীরাম। সেদিনও চরাচ্ছিল। তারিখটা ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১৪ মঙ্গলবার। হঠাৎই দেখে একটি মহিষ উধাও। একটু খোঁজ করতেই হঠাৎ একটি বাঘ লাফ দিয়ে বেনীরামের সামনে। ও চোখের সামনে কালো-হলুদ ডেরাকাটা দেখে একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সম্বিত ফিরতেই লাফ দিয়ে ও একটা লম্বা গাছে উঠে পরে। এরপর শুরু হয় বাঘের সাথে লুকোচুরি খেলা। বাঘিনীটির সাথে দুটো বাচ্চা থাকায় ও গাছের গায়ে আঁচর কাটতে থাকে। অবশেষে গাছের নিচেই ও হুঙ্কার করতে থাকে। বেনীরাম তখন প্রায় বেহুঁশ হোয়ার মত হওয়ার অবস্থা তখনই মোবাইল বেজে ওঠে। ওর মনে পরে যায় কোমড়ে গোজা ওর মোবাইলটার কথা তাড়াতাড়ি ওর এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার কথা গ্রামের সবাইকে জানায়। গ্রামবাসীগণ লাঠি, বল্লম, আগুন নিয়ে এসে গাছের তলায় জড়ো হয়। তখন বাচ্চাদের নিয়ে বাঘিনী চম্পট দিয়েছে। এরপর বেনীরামকে নিয়ে গ্রামের মানুষরা বাড়িতে ফিরে যান।

মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে বেনীরামের ধারণা রাধামাধবের দয়ায় ওর প্রাণ বেঁচেছে তাই রাধামাধবের মন্দিরে স্থান পেয়েছে এই মোবাইল সেটটি। ফুল মালা দিয়ে রোজ পুজো হয় এই মোবাইল সেটটির। অবতার মোবাইলটি দর্শণ করতে বহু গ্রাম থেকে বহু মানুষ আসেন। এই দুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এইটুকু বোঝা যে শুধু বিজ্ঞান বই পড়লেই আর নম্বরবাদের বিবর্তন ঘটালেই পরিবর্তন হবে না, চাই সঠিক চেতনার বোধ ও বিজ্ঞান মানসিকতা।

— লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬
Email : bibartancbss@gmail.com

কলিকাতা পুস্তক মেলা

পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গ্রিল্ড আয়োজিত কলিকাতা পুস্তক মেলা ২৮ জানুয়ারী ২০১৫ থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫ মিলন মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষ থেকে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে (১২৫) অংশ গ্রহণ করা হয়।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com